নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

ছোটগল্প

ভূমিকা ও সম্পাদনা

ড. রহমান রাজু

বীতংস
হাড়
পুষ্করা
বনজ্যোৎস্না
দুঃশাসন
ইতিহাস
তিতির
রেকর্ড

প্রচ্ছদ ■ আদিত্য অন্তর

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

ছোটগল্প

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
ছোটগল্প

ভূমিকা ও সম্পাদনা

ড. রহমান রাজু

ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ

প্রকাশনার একযুগ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প
ভূমিকা ও সম্পাদনা : ড. রহমান রাজু

স্বত্ব
প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ২০১৬

প্রকাশক
ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৪৭৬০, ০১৭১৫ ৪২৮২১০, ০১৭১২ ২৩৫৩৪২
e-mail : ittadisutrapat@yahoo.com
web : www.ittadigranthoprokash.com

পরিবেশক
যুক্তরাষ্ট্র : মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক
যুক্তরাজ্য : সঙ্গীতা, ২২ ব্রিক লেন, পূর্ব লন্ডন

প্রচ্ছদ
আদিত্য অন্তর

অক্ষরায়ন
বন্ধু কম্পিউটার্স
২৮/সি-২ টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা।

ছাপাখানা
নিউ এস আর প্রিন্টিং প্রেস
১০/১ বি কে দাশ রোড, ফরাশগঞ্জ, ঢাকা

মূল্য
১৫০ টাকা

Narayan Gangopadhyayer Chotogolpo by Dr. Rahman Raju, Published by Ittadi Grantho Prokash : October 2016. Price Tk. 150, ISBN: 978 984 904 550 2

সম্পাদকের উৎসর্গ

যারা গল্প ভালোবাসে...

সূচিপত্র

ভূমিকা : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পানুষঙ্গ ৯

তিতির ২৩
বীতংস ৩১
হাড় ৪৩
বন-জ্যোৎস্না ৫২
দুঃশাসন ৬৮
পুষ্করা ৭৭
ইতিহাস ৮৫
রেকর্ড ৯৯

পরিশিষ্ট : লেখকের জীবনকথা ১০৬

ভূমিকা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পানুষঙ্গ

ছোটগল্প—সাহিত্যের কনিষ্ঠ কথাকাব্যিক পরিবেশনা; একটি সৃষ্টি—একটি নির্মাণ। জীবনবিন্যাসে উপন্যাসের ক্যানভাসের চেয়েও, যন্ত্রণাজর্জর পরিস্থিতি যখন ঢেউ হয়ে আসে—শিল্পীকে সে ঢেউয়ের গতি নির্ণয় করতে হয়, সামাল দেবার মালসামানা যোগাড় করতে হয় একটি কুটির গড়ার প্রত্যয়ে—সে এক শিল্পকুটির; নাম তার ছোটগল্প। এ যেন অনবরত কল্লোলিত জীবনের ক্যানভাস; ভিতরের ঘটনা মাইক্রোস্কোপে দেখবার ব্যাপার; নিখুঁত করে বলবার ব্যাপার। আর পরিবেশনার 'কাঠামো, বিষয়বস্তু, লিপিকৌশল হচ্ছে গল্পের নানা অঙ্গ বা গল্পকে দেখার নানা পথ।' ছোটগল্পের গূঢ়তত্ত্ব আসলে আকারে নয় বিষয়ে; জীবনের ছোট ছোট ঢেউয়ে—যে ঢেউ ঘটমান বর্তমানে সবচেয়ে বড় এবং তার আছে এক স্বতন্ত্র ঝাঁঝ। ফলে গল্পকে মূলত গল্প করে তুলতে পারাটাই মুখ্য। টানটান গতিরেখায় পরিবেশ সৃষ্টি, ঘটনার একমুখী রেস, যথোপযুক্ত শব্দ-বাক্য ব্যবহার, চরিত্রঘেঁষা সংলাপ, প্রবাদ, হিউমার ও উইট সহযোগে জমিয়ে বলাটাই গল্পের আয়ু নির্ধারণ করে দেয়। এটি সরল সত্য যে, নিছকই সরলরৈখিক কাহিনি বয়ানে পাঠক আগ্রহ হারিয়ে ফেলে কিন্তু গল্পঢঙেই পাঠক গল্পভূক হয়ে ওঠে। গল্পের ভিতরেও গল্পের জন্ম হতে হয়। চরিত্র হয়ে চরিত্রের ভিতরে আরেক চরিত্র নির্মাণের খেলা করার সুযোগ পাঠকের জন্য তৈরি করে দিতে হয়। সে অর্থে গল্প তো সিক্সসম-ই।

ছোটগল্পে প্রয়োজন হয় একটা শৈলী। সহায়ক ভূমিকায় থাকতে হয় পরিমিতিবোধ; লাগামটা নিজের হাতে—তীক্ষ্ণ, চাক্ষুষ বয়ান, স্বচ্ছ দৃশ্যায়ন, অনুপুঙ্খ দৃষ্টিভাব, হিউমার, উইট, সাংকেতিকতা, প্রতীকিতা ইত্যাদি। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে, 'ভালো গল্পে সংকেতময়তা-প্রতীকিতা একেবারে সহজাত কবচ-কুণ্ডলের মতো অবিচ্ছেদ্য; আলোকের বস্তুক্ষেত্রে দাঁড়িয়েও সে নির্দেশ করছে সন্ধ্যার ছায়াচ্ছন্ন অপরিচয়ের দিকে (...) নির্দেশ করছে রহস্যের দিকে, বিস্তৃতির দিকে,

মনোলোকের গহনে, বিশ্বনীতি-জিজ্ঞাসার আকাশমুখী দুর্নিরীক্ষতায়।' শুধু তাই নয়, সংযুক্তরূপে তিনি বলেন, ভালো গল্প 'আলো-আন্ধারের দ্বৈতলীলার কেন্দ্রটিতে এসে দাঁড়ায়।' জীবন যেখানে জটিলতর; পিতা-পুত্রের বিশ্বাস যেখানে প্রশ্নবিদ্ধ সেখানে 'কী' বলছি তারও অধিক সত্য হলো 'কীভাবে' বলছি। গল্প হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে এই 'কীভাবে'টা খুব গুরুত্বপূর্ণ। 'কীভাবে'র মধ্যে নির্মেদ ব্যাপারটি ভেবে দেখবার। গল্পে অনাকাঙ্ক্ষিত বয়ানে মেদ বাড়িয়ে বেঢপ করে তুলবার কি খুব প্রয়োজন থাকে? বরং ঈশ্বরভবন থেকে নেমে আসা ঐশ্বরিয়ার মতো সৌন্দর্যমুদ্রাযুক্ত নির্মেদ গল্প নিশ্চয় পাঠকপ্রিয় হয়ে ওঠে। নদীমাতার এই বঙ্গভূমি মূলত গল্পভূমিই। জীবনের ঢেউগুলো এখানে নদীর মতোই। স্বতন্ত্র নির্মিতিতে শিল্পিত হয়ে উঠতে পারে জীবনের আখ্যান। এখানে জীবনের মূল্যবোধ যখন পারিপার্শ্বিকের চাপে নিত্যবিনষ্ট, প্রকাশকাতর ব্যক্তিচেতনা বনাম রক্ষণশীল সমাজচেতনা ও প্রচলিত বিধিবিধানের সংঘর্ষ যখন অনিবার্য, তখন ব্যক্তি-ভাবনায় দেখা দেয় বহুরৈখিক প্রশ্ন এবং চিরায়ত জিজ্ঞাসার উচ্চারণ। প্রচলিত বিশ্বাস তখন ভেঙে যায়—জীবনেরও জ্যামিতিক সূত্র পাল্টে যায়; জীবন হয়ে ওঠে অধিক জটিল। আমাদের এই চিরচেনা জটিল জীবনের রূপায়ণেই ছোটগল্পের জন্ম হয়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। বলাবাহুল্য কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে তার প্রতিষ্ঠা এবং জীবন-বাস্তবতার অন্ধিসন্ধিতে অবারিত প্রবেশ। সার্থক ছোটগল্পের এই স্রষ্টার মহাপ্রস্থানকালে বৈশ্বিক আবহে চলমান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উত্তাল দামামা। এ যুদ্ধকালের বাংলা গল্পের ভূমিতে সগর্ব আবির্ভাব নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৯১৮-১৯৭০)। বাংলা কথাসাহিত্যে বিভূতি-তারাশঙ্কর-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগত উত্তরসূরিরূপে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পৈতৃক নিবাস বরিশালের বাসুদেবপাড়া গ্রাম। কিন্তু তাঁর জন্ম দিনাজপুরের বালিয়াডাঙ্গি গ্রামে, ১৯১৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি। বাবা প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন তখন দিনাজপুরে পুলিশের দারোগা। বাবার পরিচয় শুধু পুলিশের দারোগাতেই সীমাবদ্ধ নয়; প্রচণ্ড সাহিত্যানুরাগীও। বলা হয়ে থাকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতিভার স্ফুরণ তাঁর 'পৈতৃক উত্তরাধিকার'। বাসায় ছিল চমৎকার লাইব্রেরি। বই আর বইয়ের পাশাপাশি বাসায় আসত দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রিকা। ছোটদের জন্য আসত 'খোকাখুকু', 'সন্দেশ', 'মৌচাক'। পারিবারিকভাবেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বেড়ে উঠতে থাকেন মননে-মগজে। বাবা নাম রেখেছিলেন তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ডাকনাম নারায়ণ। ডাকনামটিকেই তিনি গ্রহণ করেছেন লেখক-নাম হিসেবে। এ নামেই তাঁকে আমরা চিনি। অবশ্য লিখেছেন সুনন্দ ছদ্মনামেও। শৈশবে মা হারিয়ে বাবার সাহচর্যেই সাহিত্যে আসক্তি জন্মে তার। চার ভাই চার বোনের মধ্যে তাঁর অভাবনীয় সাহিত্যপ্রীতির বহিঃপ্রকাশ ঘটে শৈশব-কৈশোরেই। দিনাজপুর জেলা স্কুল থেকে মেট্রিক, ফরিদপুর রাজেন্দ্র

কলেজ থেকে আইএ এবং বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে বিএ পাস করেন। ১৯৪১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা বিভাগে রীতিমতো চমক সৃষ্টি করেন। রেকর্ড সংখ্যক নম্বর পেয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। অতঃপর জলপাইগুঁড়ির আনন্দচন্দ্র কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯৪২-১৯৪৬ অবধি সেখানেই। পরে ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত কলকাতা সিটি কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৫৭ সালে যোগ দেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে। আমৃত্যু এখানেই থেকেছেন তিনি। ১৯৬০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই 'সাহিত্যে ছোটগল্প' বিষয়ক অভিসন্দর্ভ রচনা করে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। রিডার পদে উন্নীত হন ১৯৬৭ সালে। ১৯৭০ সালের ৬ নভেম্বর তার জীবনবসান ঘটে।

কথাকার হিসেবে তাঁর সরব উপস্থিতি চল্লিশের দশকে। সাহিত্যজীবনের শুরুতেই বিশ্বযুদ্ধের দামামা, নির্লজ্জ প্রতারণা, কৃত্রিম সংকট, বোমার আঘাতে নষ্টপ্রায় ভূমির কাতরতা আর তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের করুণ অথচ সত্য-বাস্তবতা তাঁকে নাড়িয়ে দেয়। ফলে তিনি হয়ে ওঠেন জীবনঘনিষ্ঠ-জীবনঅন্বিষ্ট সাহিত্যশিল্পী। সাহিত্যজীবনের শুরু করেছিলেন কবিতা দিয়ে, স্কুলে পড়তে। কুড়নদার লেখা প্রীতি উপহার দেখে কবিতার প্রতি অনুরাগ জন্মালে পরক্ষণেই তিনটি কবিতা লিখলেন তিনি। 'মাস পয়লা' শিশু পত্রিকায় তা ছাপাও হয়। পুরস্কারও পান বারো আনা। এরপর কাব্যচর্চা চলেছে গল্পসত্তার আদলে, ঔপন্যাসিকের পোশাকে। কলেজের সহপাঠী নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের সাথে তার যে কাব্যসংকলন বেরিয়েছিল তার নাম *জোনাকি*। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ভাষায়—'১৯৩৯ কি ৪০ সালে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের সঙ্গে একযোগে আমার ছোট একখানি কাব্যসংকলন বেরিয়েছিল, নাম জোনাকি।' রবীন্দ্র-দ্রোহী সময়ের হলেও তাঁর কাব্যভুবন রবীন্দ্র-দ্রোহিতায় নয়। তৎসম শব্দের শিল্পিত বুনন, মানুষের ইতিহাসে প্রবল আস্থা আর গম্ভীর সুরে দৃঢ়বদ্ধ সংহতির প্রকাশ তাঁর কবিতায়। পরে তাঁর ঔপন্যাসিক ও গল্পকারসত্তার কাছে কবিসত্তা নির্লিপ্ত হয় বটে, তবে নিঃশেষ হয়নি। সমসাময়িক গল্পকারদের মধ্যে খুব এমন কেউ নেই যার গল্পকারসত্তায় কবিসত্তার ছাপ নেই। কিন্তু কেন? এর উত্তরে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের স্বীকারোক্তি—'যারা কবিতা আর গদ্য দুই-ই লেখেন, তারাই জানেন কবিতা লেখায় আনন্দ কত বেশী। কবিতা যত দুর্বল আর সমকালের তুলনায় রীতির দিক থেকে পুরাকালের হোক না, তার মধ্যে ব্যক্তিসত্তাকে যেভাবে ঢেলে দেওয়া যায়, তেমন আর কোন রচনায় যায় না।'—এ সত্য উচ্চারণের পর নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কাছ থেকে কবিতা এক সময় হাওয়া হয়ে গেলেও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে তা হয়নি। 'তাঁর ছোটগল্পে বাস্তব রুক্ষ জীবনকথারও পাড় ঘিরে কাঁপে অন্তঃশীল

কবিমনের অস্খলিত শিহরণ।' এবং সে বিবেচনায় সন্দেহ নেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় একজন পূর্ণমাত্রার খাঁটি সাহিত্যিক। সময় ও সমাজের সফল রূপকার। কবিতা-গল্প-উপন্যাস এ ত্রিধারাতেই তার সে ধার লক্ষ করা যায়। আসলে 'সমাজের নানা আবর্তে উত্থিত অমৃত পান করে শিল্পী যেমন ভাস্বর হয়ে ওঠেন, তেমনি গরলপানে তাঁকে হতে হয় নীলকণ্ঠ।' সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গেপাধ্যায়ের বেলায়ও তা সমভাবে প্রযোজ্য। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মানবপ্রত্যয় আর মার্কসীয় সাম্যচেতনার প্রভাব বোধ করি তাকে সার্থক শিল্পীর সারিতে জায়গা করে দেয়। কলেজজীবনে সাম্যবাদের ধ্যান-ধারণাপুষ্ট নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সহপাঠী ছিলেন তিনি। পার্টিকর্মী হিসেবে রাজনীতি তাঁকে উত্তেজিত করেছে কখনো কখনো কিন্তু মাটি মানুষের প্রতি মমত্ববোধের কমতি ঘটেনি তাঁর কথায়-লেখায়। একসময় তিনি উঠেছিলেন জনপ্রিয়তার শীর্ষে। ক্ষেত্রগুপ্ত বলেন—'আমাদের অল্প বয়সে যখন তারাশঙ্কর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো পয়লা সারির কথাসাহিত্যিক বাংলা গল্প উপন্যাসের আসর জাঁকিয়ে বসেছিলেন, এবং মাঝারি কিন্তু বেশ শক্তিশালী লেখকও ছিলেন অনেক এবং এঁরা সবাই নারায়ণ বাবুর চেয়ে ছিলেন বয়সে বড়, তখন নারায়ণবাবু জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছিলেন।' তাঁর প্রথম গল্প "নিশীথের মায়া" ছাপা হয় 'দেশ' পত্রিকায় ১৯৩৩-৩৪ সালে, যখন তাঁর বয়স পনের-ষোল বছর। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ও বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় তখন সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক।

তাঁর গল্পকার হয়ে ওঠা সম্পর্কে নিজের স্বীকারোক্তি—'ছোটগল্প লেখার প্রেরণা পাই বিভিন্ন লেখকের গল্প পড়ে, অচিন্ত্যকুমার, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মনোজ বসু তাদের মধ্যে প্রধান।' তিরিশের এ শক্তিশালী লেখকদের লেখা তখন অন্ত্যজ উপেক্ষিত জনের জীবনরূপায়ণ। গ্রাম-গঞ্জের সমাজচিত্র, বস্তি, গভীর অরণ্য, কয়লাখনি, এঁদো ডোবা প্রভৃতি হয়ে ওঠে গল্পের রসদ। অন্ত্যজ শ্রেণিকে নিয়ে তাঁরা কলম ধরেছিলেন শক্ত হাতে। রবীন্দ্রনাথ জেনেছেন রবীন্দ্র-দ্রোহিতায় একদল গল্পকারের সময় এসেছে এবং রবীন্দ্রনাথ নিজেও এঁদেরকে নিয়ে বেশ আশাবাদী ছিলেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করে নয়, বরং উত্তরসূরি হিসেবে স্বীয় বৈশিষ্ট্যে হয়ে ওঠেন স্বতন্ত্র। উপন্যাস রচনায়ও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা এনে দেয় গল্পসংকলন *বীতংস* (১৯৪৫) আর তিন খণ্ডের উপন্যাস *উপনিবেশ* (১৯৪৪)। তাঁকে উপন্যাস লেখায় উৎসাহ যোগান 'বিচিত্রা'র সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। *উপনিবেশে* একাকার হয়ে আছে অরণ্য, ইতিহাস-রোমান্টিকতা-রাজনীতি, সমাজজটিলতা এবং মধ্যবিত্ত জীবন। ব্যঞ্জনাবহ ও পরিশীলিত শব্দযোজনা এবং আবেগময় বর্ণনা উপন্যাসটির যোগ্যতা বাড়িয়েছে। জীবনের

বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে শিল্পিত রূপ তিনি দিয়েছেন এতে। যে জীবনকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন সে জীবনের নিখুঁত ছবি তিনি এঁকেছেন । *উপনিবেশ* রচনার পর জনৈক পাঠকের চিঠির জবাবে তিনি বলেন—'আমি গল্পই লিখিয়াছি সুতরাং কাহিনির সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন অবান্তর তবে উপাদান এবং পারিপার্শ্বিক বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতেই গ্রহণ করিয়াছি।' তাঁর *তিমিরতীর্থ* উপন্যাসটি ছাপা হয় শারদীয় দৈনিক 'কৃষক'-এ (১৩৫১)। মনোজ বসু তা প্রকাশের দায়িত্ব পালন করেন। বইটির নামকরণ করেছেন সজনীকান্ত দাস। অন্যদিকে *বীতংস* গল্পগ্রন্থ আশীর্বাদপুষ্ট হয় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বিভূতিভূষণ দেখেছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কপালে রাজতিলক। রবীন্দ্র-পরবর্তী দুজন শিল্পীর আশীর্বাদ তাকে উৎসাহ যোগায় এবং তিনি হয়ে ওঠেন কথাসাহিত্যিক। চেতনা-প্রবাহ আর অস্তিত্বের সংকটকে তিনি ঠাঁই করে দিয়েছেন তাঁর উপন্যাসে। প্রয়োজনীয় আবেগ আর কথনের স্বাতন্ত্র্যে তার উপন্যাসগুলো আলোচিত হলেও গল্পকারসত্তার প্রাঞ্জলতা বেশি। এর বাইরে তার নাটক *ভাড়াটে চাই* অভিনয় যোগ্যতায়; নাটক *রামমোহন* নাট্যপ্রতিভায় আর *আগন্তুক* তাঁর নাট্যকারসত্তারও পরিচয় তুলে ধরে। *ছোটগল্পের সীমারেখা* (১৩৭৬) তাঁর ছোটগল্পবিষয়ক বক্তৃতা। এছাড়াও *বাংলা গল্পবিচিত্রা* (১৩৬৪), *সাহিত্য ও সাহিত্যিক* এবং *সাহিত্যে ছোটগল্প* তাঁর প্রাবন্ধিকসত্তার সবিশেষ পরিচয় বহন করে। সাহিত্যে ছোটগল্পবিষয়ক পূর্ণাঙ্গ আলোচনা বোধ করি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতেই সূচনা হয়। *সাহিত্যে ছোটগল্প* প্রসঙ্গে তিনি বলেন—'প্রয়োজনীয় কতগুলি পরিভাষাও আমাকে তৈরি করতে হয়েছে। যেমন Impression-কে করেছি প্রতীতি, Anecdote কে বলেছি বৃত্তান্ত।' অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেন—'এই জাতীয় গ্রন্থ বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে দুর্লভ। একই সঙ্গে সৃষ্টিশীল লেখকের স্বচ্ছ উদার দৃষ্টি এবং সমপরিমাণ সমালোচনার বিশ্লেষণী শক্তি-সম্পদের জোরেই গ্রন্থটি বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে এক উচ্চ মর্যাদার আসন দখল করেছে।' জীবনের ৩৫ বছর (১৯৩৫-১৯৭০) ধরে তাঁর কলমে গল্পের যে বুনন তেমন করে আসেনি অন্যান্য শাখাগুলি। ফলে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচিতি গল্পকার হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত। তাঁর গল্পে পূর্বসূরিদের প্রভাব থাকলেও নিজস্বতায় তা হয়েছে স্বতন্ত্র। 'তাঁর গল্পের বলার ভঙ্গিতে আছে পূর্বসূরি তারাশঙ্করের প্রভাব, কিন্তু নিজস্বতা দিয়ে তাকে অন্যাস্বাদী করেছেন। সাম্যবাদী ভাবনা তাঁকে তাঁর একাধিক গল্পে প্রগতিবদী, গভীর মনস্ক, আগামী দিনের সুস্থ মানবসমাজ ও মানবিকবোধের গল্পকারের মর্যাদা দেয়।' নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় গল্পের শেষে চমক দেন; ভঙ্গি দিয়ে ভোলান। অল্প পুঁজিকে কাজে লাগিয়ে জীবনের খণ্ডাংশকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন ভঙ্গি দিয়ে। বিশেষ অঞ্চলের কথা রচনা করেও স্বীয় ভঙ্গি বলে তাঁর রচনা হয়েছে সর্বজনীন। সমরেশ মজুমদারকে এক দুপুরে তিনি বলেছিলেন, 'দ্যাখো আমার পুঁজি অল্প। ভঙ্গি

দিয়ে বোল ভোলাই। তাই আমার গল্পের কুষ্ঠরোগী সিনেমার পোস্টারের নায়িকার গালে ঠেঠাট রাখে।' প্রকৃত অর্থে 'কল্লোল' (১৯২৩), 'কালিকলম' (১৯২৬)'র পরের লেখকেরা কার্ল মার্কস, সিগমুন্ড ফ্রয়েড, হ্যাভলক এলিস, য়ূং'র দ্বারা প্রভাবিত। ইউরোপীয় অনুপ্রেরণা ভর করেছে তাঁদের উপর। ফলে জীবনকে নিখুঁত করে উপলব্ধির বোধের স্ফুরণ পরিদৃশ্য হয় তাঁদের সাহিত্যে এবং সে সাহিত্যে রসদ হয়ে আসে নিম্নবিত্ত, ইতর, বস্তিবাসী এমনকি ফুটপাত পর্যন্ত। আসলে 'শিল্পীর *কাজ বাস্তবতার জগৎ থেকে স্বপ্নের জগতে আশ্রয় খোঁজা নয়, বরং তার* অনুগামীদের কাছে আগামী সম্পদশালী পৃথিবীর (যা তৈরি করেছেন প্রতিটি শ্রমজীবী মানুষ) উজ্জ্বল ছবিটি তুলে ধরা।' নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সে ধারায় বিচার্য হবার দাবি রাখে। স্বপ্নজলে স্নান নয় বরং ঘৃণিত, রূঢ় বাস্তবতা অন্বেষায় ফুটিয়ে তুলেছেন স্বসমাজের জীবন্ত রূপ। 'শোষণের ছলাকলার যেমন বিধিনির্দিষ্ট কোনো রূপ নেই জীবনেরও নেই তেমনি কোনো শাস্ত্রশাসিত কাঠামো। শিল্পে তাকে নানা দিক থেকে নানাভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়।' কোনো মহৎ শিল্পীই অস্বীকার করতে পারেন না সময় ও সমাজের আবর্তে ঘুরপাক খাওয়া জীবনকে। 'লেখক যখন শিল্পীর মাত্রায় উত্তীর্ণ হয়ে সমাজে ও জীবন-দর্শনে তার প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করেন তখন তিনি নৈর্ব্যক্তিক এবং নিরলস যাত্রার পথিক।' ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৯৪৩-এর মন্বন্তর আর সাথে ঘটতে থাকে দেশ বিভাগের মতো উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর সাথে এক মোহমায়ায় ১৯৩৯ এর ৩ সেপ্টেম্বর শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। মানব-অস্তিত্ব ও অর্থনীতিতে বিশ্বব্যাপী এর প্রভাব পড়ে। ব্যাহত হয় সাহিত্য-সংস্কৃতি-জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার অগ্রযাত্রা। 'ফ্যাসিবাদী জার্মানি-ইতালি-জাপান এবং তার বিপরীতে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন-আমেরিকা-ফ্রান্স এই দুই পক্ষের সশস্ত্র অন্তর্ঘাতের পটভূমিকায় ব্রিটিশ রাজশক্তির সর্ববৃহৎ উপনিবেশ ভারতের সমাজ-অর্থনীতি ও রাজনীতি হয়েছে অমোঘভাবে প্রভাবিত।' এ অস্থির সময়ে অনবহিত থাকতে পারেননি কলকাতাকেন্দ্রিক গল্পকাররা। এ সময় 'জীবনকে অবলোকনের নানামাত্রিক প্রয়াস, কয়লাকুঠির জীবন, শ্রমে কর্মে ক্লান্ত শোষিত চরিত্র, উৎপাদন সম্পর্কের সূত্রে বৈনাশিক জীবনচরিত্র অনেক বেশি ক্লেদাক্ত করে গল্প উপন্যাসে উঠে আসতে থাকে।' নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০) এ সময়ের সারথি; উত্তীর্ণ গল্পকার।

বিচিত্র বিষয়ে সজ্জিত তাঁর গল্পকুটির। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমূহ পরিস্থিতিতে সমাজমূলে নিয়ত দৃশ্যমান জীবন কীরূপে প্রতিফলিত তা হয়ে ওঠে নারায়ণী গল্পের ক্যানভাস। তাঁর গল্পে সে কালের সামাজিক ও আর্থনীতিক প্রতিবেশ, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, মাড়ী-মন্বন্তর, দাঙ্গা, যুদ্ধ, দেশভাগ, শোষণ, দারিদ্র্য, নির্যাতন কিছুই বাদ পড়ে না। সমকালীন পরিস্থিতি সমাজ অস্তিত্বের সংকটকে চিহ্নিত করে এবং তা

তাঁর গল্পে উঠে আসে শিল্পিত সত্য হয়ে। প্রেম ও প্রকৃতি তাঁর গল্পে একটি বড় অংশ দখল করেছে। প্রকৃতি সেখানে কখনো প্রেক্ষাপট কখনো চরিত্র। প্রেম সেখানে সফল-বিফল, বৈধ-অবৈধ, বিবাহপূর্ব-বিবাহোত্তর ইত্যাদি বহুরৈখিক জলছবিতে চিত্রিত; দাম্পত্য জীবনের চিরচেনা জটিলপথ যেন রেখাচিত্রে অঙ্কিত। বীভৎস বাস্তবতায় ফ্রেমবন্দি স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব। শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার সূত্র ধরে চিত্রিত শিক্ষায়তনের নানাদিক; চরিত্র হয়ে ওঠে স্কুলশিক্ষক কিংবা অধ্যাপক নয়তো ছাত্র। নেশাসূত্রে সংগীতের সারগামও বাদ যায় না; সংগীতসাধনা, সফলতা ও বিফলতার ত্রিরৈখিক তুলিআঁচড়ও শোভা পায় তাঁর গল্পে। সময়-সমাজ ও জীবনের গ্রাউন্ডপ্ল্যান হাতে নিয়ে বোধ করি জীবন ও শিল্পের অলিগলিতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সৃজনীসত্তার বিচরণ নির্মাণ করেছে একটি ইতিহাস-ঐতিহ্যের শিল্পকুটির; ছোটগল্প।

"তিতির" *শুভক্ষণ* (১৯৬০) গল্পগ্রন্থের উল্লেখযোগ্য গল্প। গল্পটি নস্টালজিক। রাম-রহিম ধোঁয়ায় সৃষ্ট দুই দেশের দুই সীমান্তপ্রহরী সুখলাল আর জুলফিকার। সীমান্তবেড়া দেশ দুটিকে করেছে আলাদা অথচ অপূর্ব এক সম্মিলন ছিল দুদেশের মানুষের। নো ম্যান্‌স্-ল্যান্ড এ দুই বন্ধু হার্দিক সম্পর্কে বহুদিনের জমানো সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেয়। অনতিদূরে শেঠজীর গদ্দী দেখে দুজনেরই মন্তব্য যে, হিন্দুস্থান হোক আর পাকিস্তান হোক শেঠজীরা ভালোই থাকে। শুধু গরিবেরা আধাসের সুপারি নিয়ে পার হতে গেলেই গুলি খেয়ে মরে। দুজনের স্মৃতিতে ধরা পড়ে স্মৃতিজাগানিয়া ঝুমঝুমিয়া নদী। সেখানে ঘাসের বনে তিতির ডাকে। এক বন্যার কথা তাদের মনে পড়ে। 'ঝুমঝুমিয়া থেকে নয়—এলো কলকাতা থেকে, এলো লাহোর থেকে। দেখতে দেখতে মানুষ 'জানবর' হল। গোরুর মাথা পড়ল শিবমন্দিরে, ভাঙল মসজিদ, আগুন জ্বলল বাজারে, ঝুমঝুমিয়ার তিরতিরে নদীর জল দিয়ে ভেসে চলল লাশের পর লাশ। বগুলারা উড়ে পালাল, ঘাসবনের মধ্যে আর তিতির ডাকল না—শেখ ফরিদের দোয়া চাইবার মতো জোর পেল না গলায়। তখন কোথায় জুলফিকার—কোথায় সুখলাল!' এসব স্মৃতির সঙ্গে যুক্ত হয় তাদের ভিটেমাটি হারানোর স্মৃতিকথন। কামতাপরসাদ কৌশল করে জমি দখল করেছে সুখলালদের। জুলফিকারের বোনকে বিয়ে করে প্রতারণা করেছে রজ্জব আলী। এরূপ দুজনের স্মৃতিবিনিময় কথাসময়ে তিতির পর্যন্ত নিঃশব্দ। কিন্তু হঠাৎ নো ম্যান্‌স্ ল্যান্ড-এ ফণা তোলে গোখরো। জুলফিকার তার রাইফেলের কুদোয় থেতলে একাকার করে ফেলে গোখরোটাকে। নো ম্যান্‌স্ ল্যান্ড-এ গোখরোরা বাসা বেঁধেছে। এখানে এরূপ অনেক সাপ আছে বলেই দুই সীমানায় এত ফারাক। একটা জিপ গাড়িতে সার্জেন্ট মেজরের আগমন ঘটে। মাথা থ্যাতলানো সাপটা স্থির হয়ে আসে। আর তিতির ডাকতে থাকে। সুখলাল আর জুলফিকারের কথার সময়

তিতির নিস্তব্ধ থেকে শোনে আর মাথা থ্যাতলানো গোখরো স্থির হয়ে এলে তিতির ডাকতে শুরু করে। সীমান্তবর্তী নো ম্যান্‌স্ ল্যান্ডের জনজীবন বাস্তবতা, মায়াময় সৌহার্দ্যপূর্ণ ঐক্যের অতীত আর বর্তমান বিষাক্ত সুবিধাভোগী শ্রেণির স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে তিতির গল্পে। গোখরোদের কারণেই নো ম্যান্‌স্ ল্যান্ডের মানুষের স্বতন্ত্র পরিচিতি মেলে না। গোখরোদের শেষ করতে পারলেই হয়তো একদিন নাগরিক মর্যাদা ফিরে পাবে নো ম্যান্‌স্ ল্যান্ডের বাসিন্দারা এমন ইঙ্গিত গল্পটিতে বাড়তি মাত্রা যুক্ত করেছে। দেশবিভাগোত্তর জনজীবনছবিনির্ভর গল্প "তিতির"।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতিনিধিত্বকারী গল্প "বীতংস"। গল্পটি কৃষিজীবী অরণ্যচারী মানুষের মজুর তৈরির ফাঁদ। *বীতংস* (১৩৫২) গল্পগ্রন্থের নাম গল্প এটি। আরণ্যক সভ্যতার অবসান ঘটিয়ে যন্ত্র-সভ্যতায় প্রত্যর্পিত জীবনকেন্দ্রিক এ গল্পে আসামের চাবাগানে কুলিযোগান সমস্যা আর সে সমস্যা নিরসনে সাঁওতাল পরগনার কৃষিজীবী মানুষকে ফাঁদে ফেলে কুলি-মজুরে পরিণত হওয়ার কাহিনি বর্ণিত সুন্দরলালের সাধুসত্তার আড়ালে পরিবেশিত। সাঁওতাল পরগনার মানুষ অশিক্ষিত, অসহায়, কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তারা বিশ্বাস করে ধর্মীয় অলৌকিকতায়, মান্য করে সাধু-সন্ন্যাসীদের। ফলত শিকার হয় নির্মমতার। এ পরগনায়—'ডুমডুম করে টিকারা বাজে। হাওয়ায় হাওয়ায় স্বপ্নের মতো শালের ফুল উড়ে যায়। মহুয়াবন আকুল হয়ে ওঠে, ছোট ছোট গোলাপ জামের মতো মহুয়ার ফলগুলি তিক্তমধুর রসে টসটস করতে থাকে, আর তার গন্ধে হরিয়ালের দল এসে ডালে পাতায় নাচানাচি করে।' সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ ভূতপ্রেত বিশ্বাস করে। পাশাপাশি ধর্মে-কর্মে বিশ্বাসী মানুষগুলো বেশ অভাবী। বুধনীকে সুন্দরলাল তাই শাড়ি, চুড়ি, তেলের লোভ দেখালে বুধনী খেই হারিয়ে হারিয়ে ফেলে—'শহর! শাড়ি-চুড়ি! একটা অদ্ভুত স্বপ্ন-লোক।' সুন্দরলাল তার স্বপ্নচরিতার্থতায় সিঁড়ি হিসেবে শিঙবোঙার দৈববাণীকে কাজে লাগায়। হয়জার মড়ক আর করমদেবতার রাগ নিশান উড়িয়ে সুন্দরলাল সন্ন্যাসজীবনের অবসান ঘটিয়ে বিয়াল্লিশজন কুলিয়ে নিয়ে যায় চা বাগানে। হিসেব করে—'বুধনীকে বাদ দিলে, বেয়াল্লিশজন কুলিতে তার কমিশন পাওয়া হয় কত?'

গল্পটিতে একদিকে যেমন ফুটে উঠেছে সাঁওতাল পরগনার সাঁওতালদের জীবনচিত্র, অভাব-অনটন, ধর্মীয় সংস্কার আর অন্যদিকে তেমনি এসেছে আসামের চা বাগান যেখানে কুলি-মজুরের অভাবের চিত্র। সেখানকার জীবন কালাজ্বরে আক্রান্ত। মজুর খাটতেও মানুষ সেখান যায় না। আর পাশাপাশি উন্মোচিত হয়েছে সুন্দরলাল—যারা সুন্দর লালের আড়ালে ধারণ করে একটি ঘৃণ্য রঙ।

বীতংসের (১৩৫২) "হাড়" গল্পে তুলে এনেছেন নগর কলতকাতা-কেন্দ্রিক ১৯৪৩-এর নির্মম দুর্ভিক্ষের ছবি। উত্তম-পুরুষে বর্ণিত এ গল্পে দারিদ্র্য আর বিলাসিতার

বিপরীতধর্মী চিত্র প্রতিফলিত। গল্পকার একদিকে বুভুক্ষু মানুষের আর্তনাদ আর অন্যদিকে রায়বাহাদুর শ্রেণির বিলাসিতায় হাড়কে এনেছেন প্রতীকী ব্যঞ্জনায়। "হাড়" রায়বাহাদুরের কাছে যাদুবাহন আর অন্যদিকে-'কাঠির মতো হাত-পা আর বেলুনের মতো পেটওয়ালা একটা ছোট ছেলে দুহাতে কী যেন চুষছে প্রাণপণে। হাড়? হ্যাঁ হাড়ই তো।' জঠরদহন নিবারণ। এমন বৈপরীত্য বিশ্বযুদ্ধকালীন কলকাতার চিত্র। রায়বাহাদুরের লোহার ফটক, আসফাল্টের চওড়া রাস্তা, কালো মার্বেল বাঁধানো সিঁড়ি, রঙিন কাচের জানালায় সিল্কের পর্দা, চীনামাটির টবে কম্পমান অর্কিড, গ্রান্ডিফ্লোরার উগ্র সুরভি; আর অন্যদিকে মনোহরপুকুর পার্কের বুভুক্ষু কলোনি, কালো জিভ দিয়ে হাইড্রোজেন জল চাটা, একমুঠো ভাত আর এক খাবলা বজরার জন্য আর্তনাদ, হানাহানি—সবই নগর কলকাতার রূপ। তখন—'তাহিতি দ্বীপে মানুষ পুড়ছে না, পুড়ছে কলকাতা।' 'ম্যাডোনা ৪৩' এর জীবন্ত ছবি আঁকতে চেয়েছেন গল্পকার। গল্পের শেষদিকে বিস্ময়জিজ্ঞাসা—'কলকাতার আকাশেও কি মেঘ করেছে, ভালো করে তারাগুলোকে দেখতে পাচ্ছি না!' গল্পের শেষাংশে 'হাড় ওরা পেয়েছে, কেবল মন্ত্র পাওয়াটাই বাকী।' লাইনটি সর্বহারা বিপ্লবের ইঙ্গিত বহন করে। বোমাবিধ্বস্ত নগর কলকাতার তেতাল্লিশের মন্বন্তররূপ রূপায়ণের মধ্য দিয়ে গল্পকার করুণ রসাবেদনে জারিত করেন পাঠককে এ গল্পে। একইসাথে চেনা হয়ে যায় কলকাতা আর মন্বন্তর।

বনজ্যোৎস্না (১৭৭৬) গল্পগ্রন্থের নামগল্প "বনজ্যোৎস্না" গল্পটি ভুটানি মেয়ে শিউকুমারীর লাঞ্ছনা, পরাজয়ের কাহিনি। ডুয়ার্সের জঙ্গলের জলঢাকা নদীপাড় তার পরিবেশ সহায়ক অনুষঙ্গ। গল্পকারের বর্ণনায় 'ওপারে ভুটানের কালোপাহাড়। আর তলা দিয়ে ছেদহীন অরণ্য—ডুয়ার্স থেকে টেরাই। দুর্গমতার ওপারে প্রতিরোধের তর্জনী। দেবতাত্মা নটাধিরাজের অলঙ্ঘ্য প্রকার। আলোয় ধোয়া আকাশের নিচে পৃথিবীর বুক ঠেলে ওঠা কালো বিদ্রোহ। আর সামনে পাহাড়ি নদী জলঢাকা।' এ জঙ্গলে অজ্ঞান অবস্থায় স্বাধীনতা সংগ্রামী মহিতোষ শিউকুমারীর আশ্রয়ে সুস্থ হয়ে ওঠে। উভয়ের মধ্যে ভালোবাসার জন্ম নেয়। মহীতোষ তো ফেরারী আসামি। শিউ মহীতোষকে পালানোর প্রস্তাব দেয়। টাকা ছাড়া পালাতে পারে না মহীতোষ। কাঠকারবারী বলদেওর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে টাকার জন্য। তিনশো টাকা। এরই মধ্যে দেশনেতা অরবিন্দ এসে মহীতোষকে নিয়ে যায়। কিন্তু শিউকুমারী যার জন্য দেহবিক্রি করল, যার সঙ্গে থাকবে বলে স্বপ্ন বুনল আদর্শের সংগ্রামে অংশগ্রহণ থেকে তাকে আটকাতে পারল না। বনজ্যোৎস্নার আলোয় যার সন্ধান পাওয়া দাবাগ্নির আলোয় তাকে হারিয়ে শিউকুমারী একা। তার বিরহপর্বের একান্ত সঙ্গী প্রকৃতি। যেন 'জ্যোৎস্নায় ঝলসে যাচ্ছে জলঢাকা। শান্ত ঘুমন্ত আলোর বাঁকা

তলোয়ার নয়। পাহাড়িরা যাকে সোনালি অজগর বলে এ যেন ঠিক তাই। ক্ষুধার্ত সোনালি অজগরের মতো গর্জন করে এঁকেবেঁকে ছুটে চলেছে—যেন মুখ থেকে ছিটকে পালিয়ে যাওয়া শিকারের সন্ধানে তার অভিযান।' সংগ্রামী জীবনে প্রেম আর আদর্শের কাছে পরাজয় দুয়ের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে "বনজ্যোৎস্না"য়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন বস্ত্রসংকটকে কেন্দ্র করে মুচিপাড়াকে ক্যামেরাবন্দি করেছেন গল্পকার *দুঃশাসন* (১৩৫২) গল্পগ্রন্থের "দুঃশাসন" গল্পটিতে। গল্পটি প্রতীকী। মহাভারতের পাশবিক দুঃশাসন এখানে প্রতীকায়িত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন বস্ত্রসংকটকে যেন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের মতো ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। দেবীদাস কাপড় ব্যবসায়ী। চোরাকারবারী। যাত্রার পঞ্চাশ টাকা দিতে তার বাধে না, বাধে একখানা কাপড় দিতে। অনালোকিত গ্রাম; বিবস্ত্র মানুষ। তখন 'ডেলাইটে' যাত্রা চলে 'দুঃশাসনের রক্তপান' ব্যঙ্গচ্ছলে। যাত্রার দ্রৌপদীকে বিবস্ত্র করার জন্য ভীম দুঃশাসনকে হত্যা করে রক্তস্নান করেছিল। কিন্তু এ সময়ে তা সম্ভব হয় না। সময় বদলেছে। সে যুগে দ্রৌপদী ছিল, ছিল ভীমও। কিন্তু আজ মুচিপাড়ায়—যেখানকার জীবনে বেড়া ভেঙে শেয়ালে নিয়ে যায় ছেলে। আলোর অভাব। পুত্রহারা মা ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে। মুচিপাড়ার লক্ষ্মণের বাড়িতে দেবীদাস ঢোকার সময় এক ষোড়শী নারী চোখে পড়ে। সম্পূর্ণ নগ্ন। যেন—'যুগের দুঃশাসন নির্লজ্জ পাশব হাতে বস্ত্রহরণ করেছে তার, তার সমস্ত লজ্জা, সমস্ত মর্যাদাকে নিষ্ঠুর উপহাসে মেলে দিয়েছে লোলুপ পৃথিবীর সামনে।' মুচিপাড়ার মধ্য দিয়ে সে সময়ের সমগ্র পরিস্থিতিকে বোঝাতে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেখিয়েছেন গল্পকার। দেবীদাসের ভাইপো গৌরদাস একদল কৃষকের হাতে হেঁসো দেখে ভাবে একদিন তারা ভীম হবে। মুচিপাড়ার এ দৃশ্য মানবতায় কড়া নাড়ে। মনে পড়ে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের "বস্ত্র" আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "দুঃশাসনীয়" গল্প। মূলত 'যুদ্ধ, মন্বন্তর, মুদ্রাস্ফীতি ও কালোবাজারির প্রেক্ষাপটে নিরন্ন, বস্ত্রহীন বাংলার এক অভিশপ্ত স্মৃতি' গল্পটিতে পুরাণের আভরণে পরিবেশিত।

"পুষ্করা" *দুঃশাসন* (১৩৫২) গল্পগ্রন্থের প্রতিনিধিত্বকারী গল্প। শ্মশানকালীর কোপানল থেকে মন্বন্তরে মুক্তিপ্রত্যাশী গ্রামবাসীর প্রতিনিধি তর্করত্ন শ্মশানে শিবাভোগের আয়োজন করে শুক্লা চতুর্দশীর রাতে। তর্করত্ন বিশ্বাস করে দেবীকে ভোগ দিলে আর দেবী সে শিবাভোগ গ্রহণ করলে গ্রামে কলেরার হাত থেকে মুক্তি মিলবে; বহু প্রাণ বাঁচবে। নয়তো অনাবৃষ্টি পুষ্করা হবে। এজন্য ভোগ সাজিয়ে তর্করত্ন ধ্যানস্থ। শেয়ালরূপে শিবাভোগ গ্রহণ করবে কালী। কিন্তু কালীর সন্ধান মেলে না। তর্করত্ন উৎকণ্ঠিত। দুর্ভিক্ষপীড়িত এ অঞ্চলে তর্করত্নের গভীর বিশ্বাস ও সংস্কার যে, দেবী ভোগ নেবেনই। ঘড়ির কাঁটায় তখন রাত তিনটে। ধ্যানমগ্ন

তর্করত্ন একসময় নিঃসাড় হয়ে পড়েন। 'দেখলেন শিবাভোগের সামনে দুটো চোখ আগুনের মতো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। দুহাতে সে শিবাভোগ গোগ্রাসে খাচ্ছে, তার দাঁতে লুচি আর মাংস চিবানোর একটা হিংস্র শব্দ অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে তর্করত্নের কানে ভেসে এল।' কিন্তু শেয়ালের তো হাত থাকে না। তবে কি দেবী স্বমূর্তিতেই হাজির? তর্করত্ন তা-ই বিশ্বাস করেন। 'স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে একমাথা ঝাঁকড়া চুল, কুচকুচে কালো গায়ের রঙ, অর্ধনগ্ন নারীমূর্তি।' তর্করত্ন জয় মা শ্মশানকালী, জয় মা মহাকালী রব তোলে। অতঃপর তর্করত্নের ফিরবার পালা। পুরো ঘোষপাড়া থেকে দান-দক্ষিণায় গাড়ি বোঝাই তর্করত্ন ফিরবার পথে গাড়োয়ান থমকে দাঁড়ায়। ডোমপাড়ার পাগলিটা রাস্তায় পড়ে আছে। 'আকালে ওর তিনটে বেটা আর সোয়ামি না খেয়ে মরে গেছে।' এ পরিস্থিতিতেও তর্করত্ন মহাকালীর প্রার্থনা করে। প্রকৃত অর্থে ' শ্মশানকালী এসেছিল ও ডোমপাড়ার পাগলিটার রূপ ধরেই—আর এখনো পথের ধুলোয় পড়ে সে মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করছে—কালীর মতো জিভ মেলে হাঁপাচ্ছে একফোঁটা জলের জন্যে। দীর্ঘদিনের বুভুক্ষার পরে দেবভোগ্য শিবাভোগ সে সহ্য করতে পারেনি।...মারী আর মড়কের সমস্ত বিষ চিরকাল ওরাই নীলকণ্ঠের মতো নিঃশেষে পান করে নেয়।' ডোমনী ক্ষুধার তাড়নায় সংস্কার ভেঙে দেবাভোগ গ্রহণ করেছে বটে কিন্তু জলের অভাবে মরণ থেকে রক্ষা মেলেনি। একদিকে ক্ষুধা ও মৃত্যুর হাতছানি অন্যদিকে সংস্কার এ গল্পের শিরা-উপশিরায় বিরাজিত।

"ইতিহাস" নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিখ্যাত ছোটগল্প। *ভোগবতী* (১৩৫২) গল্পগ্রন্থের এ গল্পে গৌড়বঙ্গের ইতিহাসে তাঁর আগ্রহ অনুরণিত। অবসর জীবনে স্কুলশিক্ষক অমরেশ নতুনভাবে গৌড়ের ইতিহাস লিখতে শুরু করেন। ১৯৪২ সালের আগস্ট মাস। আসমুদ্রহিমালয়ে আগুন। লোকেশ বন্দেমাতরম্ আন্দোলনে। তার নীড়ের মোহ নেই; দিগন্তের দাবি এসেছে। অমরেশ বাস্তবকে অস্বীকার করে বাস্ত ইতিহাস পুনরুদ্ধারে আর লোকেশ বাস্তবকে বুকে ধারণ করে এলো তিনদিন পর শহর থেকে। তাকে আনা হয়েছে গরুর গাড়িতে রাশি রাশি কলাপাতায় মুড়িয়ে। সারা গায়ে কয়লার গুড়ো মাখা যাতে পচে না যায়। কেমন একটা উৎকট গন্ধ। শবব্যবচ্ছেদে সমস্ত শরীর ক্ষত-বিক্ষত; কালো রক্ত এখানে ওখানে জলকাতরার মতো শুকিয়ে গেছে। বুলেটের প্রকাণ্ড ক্ষতচিহ্ন বুকের বাঁ পাশটায় হাঁ করে আছে। রক্তহীন দেহের নীলরঙের বিদীর্ণ হৃৎপিণ্ডের আভাস। চোখর জলে ভাইকে ভুলতে চায় প্রণতি। পারে না। নিতাই জেল থেকে বেরিয়ে প্রতিশোধ নিতে চাইলে প্রণতির অনুরোধে তাও বন্ধ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত উন্মাদপ্রকৃতি ঝড়ঝঞ্ঝায় অমরেশের বাড়িতে দারোগাসহ আড়াইশো লোকের সমাগম হয়। প্রণতি দারোগার হিম হয়ে যাওয়া শিশুকে ঘরে নিয়ে যায়। দারোগার স্ত্রীকে কাপড় বদলাতে বলে।

তখন অমরেশ ইতিহাস লিখছেন তার গৌড়বঙ্গের স্বপ্নরঙে—'চরম দুর্গতির পরমলগ্নে সমস্ত জাতি আসিয়া দাঁড়াইবে সর্বজনীন ঐক্যের বেদীতে। যাহারা পরস্পরের বুকে আঘাত হানিতেছে...মোহে অন্ধ হইয়া স্বার্থে আত্মবিস্মৃত হইয়া—সেদিন সর্বগ্রাসী মৃত্যুর হাত হইতে নিজেদের বাঁচাইতে গিয়া তাহাদের হাতে হাতে রাখী বাঁধিতে হইবে। দেশে দেশে ইতিহাসের ইহাই শিক্ষা।' মৃত অতীতের তথ্য আর চলমান জীবন—দুই-ই ইতিহাস। ইতিহাসসচেতন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বিশ্বমানচিত্রে গৌড়বঙ্গের ইতিহাসের ছবি আঁকেন এ গল্পে। শৌর্য বীর্যশালী বাঙালির ভালো একটি ইতিহাস নেই এই অভাববোধ থেকেই লেখনীধারণ, কিন্তু ইতিহাস আসলে কাকে গ্রহণ করে? জীবনযুদ্ধে ইতিহাস রচনাকারীকে নাকি প্রদীপের আলোয় ইতিহাসের তথ্যপঞ্জী সংগ্রহকারীকে? গল্পটি পাঠান্তে সে প্রশ্নই উঁকি দেয়। গল্পটি ক্যালকেমিকো কর্তৃক পুরস্কারপ্রাপ্ত।

সংগীতানুরাগী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুরনো রেকর্ড সংগ্রহ করবার খুব শখ ছিল। *শুভক্ষণ* (১৯৬০) গল্পগ্রন্থের "রেকর্ড" গল্পটি সেই পুরনো রেকর্ড সংগ্রহ করবার কাহিনি। 'যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন'—প্রবাদটির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত "রেকর্ড" এ গল্পটি। সেকেন্ড হ্যান্ড মার্কেটে স্তূপাকার করা বহু পুরনো রেকর্ড। অনেক রেকর্ডের ভিতর থেকে বারো আনায় যে রেকর্ডটা কেনা হলো তার অদ্ভুত বাজনা অদ্ভুত সুর। আগে কখনো শোনা হয়নি অথচ এত পরিচিত যেন রক্তে দোলা লাগে। স্ত্রী করুণাসহ দুজনকেই আচ্ছন্ন করে ফেলল রেকর্ডটা। 'খুব চেনা মানুষের নাম মনে করতে না পারলে, চাবির গোছা এইমাত্র কোথাও রেখে তারপরে আর খুঁজে না পেলে যেমন একটা ছটফটানি জেগে ওঠে, ঠিক সেই রকম।' কিন্তু কিসের রেকর্ড এটি। করুণার কাছেও স্বচ্ছ নয়, সংগীতজ্ঞ আইভির কাছেও নয়। কখনো মনে হয় এ যেন ব্রহ্মপুত্রের বর্ষামাদল কিংবা নাগা পাহাড়ের ঢাকের শব্দ, কখনো ছৌনাচের নাগারা অথবা বালুঘাটের টিকারা, কিংবা মার্কাস স্কোয়ারের বাঘের ডাক। সমস্ত জট খুলে যায় একজন ভূপর্যটকের মাধ্যমে। তিনি জানান এ রেকর্ডটা দুষ্প্রাপ্য। তৈরি হয়েছিল গোপনে, বিলিও হয়েছিল সামান্য। নাৎসিদের গুলিতে নিহত হয়েছে এ রেকর্ডের প্রত্যেক শিল্পী। 'নাৎসী অধিকারের সময় এই রেকর্ডটি ছিল সেখানকার মুক্তিযোদ্ধাদের গান। হিটলারের গোয়েন্দারা দাবি করেছিল এর প্রতিটি কপি, এর অরিজিনাল—এর প্রত্যেকটি শিল্পীকে তারা লিকুইড করেছে।' এবার সত্যিকার উপলব্ধিতে এলো ধমনিতে প্রবাহিত মুক্তিসংগ্রামের এ সমবেত সংগীতের রেকর্ড যা চাইলেও কখনো নিশ্চিহ্ন হয় না। প্রতিরোধ-প্রতিবাদের সুর থাকে ধমনিতে। ফলে মুক্তিসংগ্রামী সুর পরিচিত মনে হয়। "রেকর্ড" গল্পের পুরনো রেকর্ডটি তাই প্রমাণ করে।

সমাজ ও রাজনীতিসচেতন গল্পকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সাম্যবাদী ভাবনায় গভীরমনস্ক—প্রগতিশীল। 'রাজনীতি তাকে উত্তেজিত করে, কিন্তু মাটি ও মানুষের প্রতি তাঁর মুগ্ধতা আরও তীব্র, গভীর হয়, ঘনিষ্ঠ সহজ রক্তের আত্মীয়তা এনে দেয়।' আর সামাজিক জীবরূপে 'জীবনকে ভালোবাসাই একমাত্র সত্য' হিসেবে মনে এবং মেনে নিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং তৎপরবর্তী মন্বন্তর, বস্ত্রসংকট, জীবন্ত দরিদ্রের প্রতি অভিজাতের অবহেলা, দালাল প্রবঞ্চনা, ভাগ্যবিরূপ হতাশ্বাস, দাম্পত্যজীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ, প্রেমের রকমফের, সাম্প্রদায়িক বিভেদ প্রভৃতি তাঁর গল্পে করে তোলেন বিষয়। ইতিহাস আর সামাজিক প্রেক্ষাপটে স্ফুরিত তাঁর কলম; মাটি মানুষ স্পষ্ট উদ্ভাসিত তাঁর গল্পের পরতে পরতে। 'দক্ষিণ বঙ্গের জলজঙ্গলাকীর্ণ অগঠিত কোমল নিম্নভূমি, না হয়তো উত্তরবঙ্গের অরণ্যগর্ভ উচ্চাবচ তরাই অঞ্চলের মাটির রস-গন্ধ-স্বাদে সজীব জীবনের মুঠোয় ধরা অবিকল ছবি শিল্পীর স্বপ্ন মোহাবেশ ঘিরে এক হিল্লোলিত রূপ ধরেছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথারচনায়; ছোটগল্পেও।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ফূর্ত মানবপ্রত্যয়কে তিনি পরিত্যাগ করেননি বরং পাশাপাশি মার্কসীয় চিন্তাচেতনার আবহ সঞ্চারিত করেছেন তাঁর গল্পে। ইতিহাসের খাতায় সময়ে অসময়ে গল্পের আঙ্গিকের পালাবদল ঘটেছে। এ পালাবদলের প্রবলস্রোতের তোড়ে ম্লান হয়ে গেছে অনেকেই কিন্তু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় গল্পের বিষয়, ভাব ও ভঙ্গিবলে হয়েছেন কালোত্তীর্ণ।